ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি:পদ

পদ–প্রকরণ

অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা বাঙালির চিরায়ত স্বপ্ন স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন এবং তাঁরা বর্তমানে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। উপরের বাক্যটিতে ব্যবহৃত 'ঈ'(সাহস+ঈ), 'রা'(মুক্তিযোদ্ধা+রা), 'র'(বাঙালি+র), 'এ'(বর্তমান+এ), 'কে'(দেশ+কে) ইত্যাদি চিহ্নগুলোকে বলা হয় বিভক্তি। এই সমস্ত বিভক্তি যুক্ত শব্দই পদ। অন্যভাবে বলা যায় বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই পদ।

প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী পদগুলো প্রধানত দুই প্রকার : যথা-

ক। সব্যয় পদ।
খ। অব্যয় পদ।

ক। সব্যয় পদ: সব্যয় পদ চার প্রকার : যথা- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া।

সুতরাং প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী পদ পাঁচ প্রকার। যথা:

(১) বিশেষ্য
(২) বিশেষণ
(৩) সর্বনাম
(৩) ক্রিয়া এবং
(৫) অব্যয়।

আলোচ্য বাক্যটিতে:

১. বিশেষ্য পদ : মুক্তিযোদ্ধা, বাঙালি, স্বপ্ন, স্বাধীনতা, বর্তমান, দেশ, রাষ্ট্র, প্রচেষ্টা ।
২. বিশেষণ পদ : অসীম, সাহসী, চিরায়ত, উন্নত, পরিণত,
৩. সর্বনাম পদ : তাঁরা
৪. ক্রিয়াপদ : দিয়েছেন, চালাচ্ছেন, এনে, করার (অসমাপিকা ক্রিয়া)
৫. অব্যয় পদ : এবং , জন্য

তবে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থে পদকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো :

(১) বিশেষ্য, (২) বিশেষণ, (৩) সর্বনাম, (৪) ক্রিয়া, (৫) ক্রিয়া বিশেষণ,
(৬) যোজক, (৭) অনুসর্গ ও (৮) আবেগ শব্দ।

বিশেষ্য পদ

যে পদ দ্বারা কোনো কিছুর নাম বোঝায় তাই বিশেষ্য পদ।

বাক্য মধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য পদ বলে। বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার

১. সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য (Proper Noun)
২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)
৩. বস্তু (বা দ্রব্য) বাচক বিশেষ্য (Material Noun)
৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)
৫. ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun)
৬. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)

১. সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বোঝানো হয়, তাকে সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য বলে। যথা:

(ক) ব্যক্তির নাম : রবীন্দ্রনাথ, শামসুর রাহমান, সেলিনা
(খ) ভৌগোলিক স্থানের : রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, পাহাড় পুর
(গ) ভৌগোলিক সংজ্ঞা : (পর্বত, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি) যমুনা, তিস্তা, লালমাই, বঙ্গোপসাগর
(ঘ) গ্রন্থের নাম : অগ্নিবীণা, গীতাঞ্জলি, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, বিশ্বনবি।

২. **জাতিবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো এক জাতীয় পদার্থ বা প্রাণীর সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- হাস, মুরগি, মানুষ, গরু, পাখি, গাছ, পবর্ত, নদী, জাপানি।

৩. **বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য :** যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। এই জাতীয় বস্তুও সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যথা- বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল ,চিনি, লবণ, পানি।

৪. **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য :** যে পদে বেশকিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তা-ই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যথা- সমিতি, সভা, জনতা, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল।

৫. **ভাববাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যথা- গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), দেখা, শোনা।

৬. **গুণবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুও দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তা-ই গুণবাচক বিশেষ্য। যথা- মধুর মিষ্টত্বেও গুণ- মধুরতা, তরল দ্রব্যের গুণ-তারল্য, তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ- তিক্ততা।
তুরুণের গুণ- তারুণ্য ইত্যাদি। তদ্রুপ : সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ।

বিশেষণ পদ

বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

চলন্ত গাড়ি : বিশেষ্যের বিশেষণ।
করুণাময় তুমি : সর্বনামের বিশেষণ।
দ্রুত চল : ক্রিয়া বিশেষণ।

বিশেষণ দুই ভাগে বিভক্ত । যথা-

নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।

১. **নাম বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যথা-

বিশেষ্যের বিশেষণ : সুস্থ সবল দেহকে কে না ভালোবাসে ?
সর্বনামের বিশেষণ : সে রূপবান ও গুণবান।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ

ক. রূপবাচক : নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কালো মেঘ।
খ. গুণবাচক : চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠাণ্ডা হাওয়া।
গ. অবস্থাবাচক : তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা।
ঘ. সংখ্যাবাচক : হাজার লোক. দশ দশা, শ টাকা।
ঙ. ক্রমবাচক : দশম শ্রেণি, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা।
চ. পরিমাণবাচক : বিঘাটেক জমি, পাঁচ শতাংশ ভূমি, হাজার টনী জাহাজ, এক কেজি চাল, দু কিলোমিটার রাস্তা।
ছ. অংশবাচক : অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল, সিকি পথ।
জ. উপাদানবাচক : বেলে মাটি, মেটে কলসি, পাথুরে মূর্তি।
ঝ. প্রশ্নবাচক : কতদূর পথ? কেমন অবস্থা ?
ঞ. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ।

বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠনের পদ্ধতি

ক. ক্রিয়াজাত : হারানো সম্পত্তি, খাবার পানি, অনাগত দিন।
খ. অব্যয়জাত : আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা, হঠাৎ বড়লোক।
গ. সর্বনাম জাত : কবেকার কথা, কোথাকার কে, স্বীয় সম্পত্তি।
ঘ. সমাসসিদ্ধ : বেকার, নিয়ম- বিরুদ্ধ, জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর।
ঙ. বীপ্সামূলক : হাসিহাসি মুখ, কাঁদকাঁদ চেহারা, ডুবুডুবু নৌকা।
চ. অনুকার অব্যয়জাত: কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি আগুন, টসটসে ফল, তকতকে মেঝে।
ছ. কৃদন্ত : কৃতী সন্তান, জানাশোনা লোক, পায়ে-চলা পথ, হৃত সম্পত্তি, অতীত কাল।
জ. তদ্ধিতান্ত : জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠো পথ।
ঝ. উপসর্গযুক্ত : নিখুঁত কাজ, অপহৃত সম্পত, নির্জলা মিথ্যে।
ঞ. বিদেশি : নাস্তানাবুদ অবস্থা, লাওয়ারিশ মাল, লাখেরাজ সম্পত্তি, দরপত্তনি তালুক।

২. **ভাব বিশেষণ :** যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকেড়ড়ড়;ড়; বিশেষিত করে তা-ই ভাব বিশেষণ। ভাব বিশেষণ চার প্রকার : যথা-

ক) ক্রিয়া বিশেষণ।
খ) বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ
গ) অব্যয়ের বিশেষণ
ঘ) বাক্যের বিশেষণ

১. ক্রিয়া বিশেষণ : যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা-

ক. ক্রিয়া সংগঠনের ভাব : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।
খ. ক্রিয়া সংগঠনের কাল : পরে একবার এসো।

২. বিশেষণীয় বিশেষণ : যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষনীয় বিশেষণ বলে। যথা-

ক. নাম বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।
খ. ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ : রকেট অতি দ্রুত চলে।

৩. অব্যয়ের বিশেষণ : যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা- ধিক্ তারে, শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।

৪. বাক্যের বিশেষণ : কখনো কখনো কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যেও বিশেষণ বলে। যেমন-

দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন- যমুনা একটি দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। সূর্য , পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য বৃহত্তম, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে বৃহত্তম এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম।

ক. বাংলা শব্দের অতিশায়ন

১. বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে চাইতে , চেয়ে, হইতে ,হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তারতম্য বোঝাতে প্রথম বিশেষ্যটি প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে এবং মূল বিশেষণের পর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। যথা- গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি ।বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়ন : অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে , সব থেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হয়। যথা-
নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান। ভাইদের মধ্যে বিমলই সবচইাতে বিচক্ষণ। পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।

৩. দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষনীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যথা-
পদ্মফুল গোলাপের চাইতে অনেক সুন্দর। ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী। কমলার চাইতে পাতিলেবু অল্প ছোট।

৪. কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন-
এ মাটি সোনার বাড়া।

খ. তৎসম শব্দের অতিশায়ন

১. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে 'তর' এবং বহুর মধ্যে 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন-
গুরু-গুরুতর- গুরুতম। দীর্ঘ-দীর্ঘতর-দীর্ঘতম।
কিন্তু 'তর' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণটি শ্রুতিকটু হলে 'তর' প্রত্যয় যোগ না করে বিশেষণের পূর্বে 'অধিকতর' শব্দটি যোগ করতে হয়। যেমন- অশ্ব হস্তী অপেক্ষা অধিকতর সুশ্রী।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন-
মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। দেশসেবার মহত্তম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।

৩. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনায় 'ঈয়স' প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। বাংলায় সাধারণত 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় না। যেমন-

মূল বিশেষণ	দুয়ের তুলনায়		বহুর তুলনায়
লঘু	লঘিয়ান	(বাংলায় ব্যবহার নেই)	লঘিষ্ঠ
অল্প	কনীয়ান		কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ	জ্যায়ান		জ্যেষ্ঠ
শ্রেয়	শ্রেয়ান		শ্রেষ্ঠ।

উদাহরণ : তিন ভাইয়ের মধ্যে রহিমই জ্যেষ্ঠ এবং করিম কনিষ্ঠ। সংখ্যাগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বের কর।

৪. 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত কোনো কোনো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ বাংলায় প্রচলিত আছে। ভূয়সী প্রশংসা।

একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন-

ভালো	: বিশেষণ রূপে	-	ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
	বিশেষ্য রূপে	-	আপন ভালো সবাই চায়।
মন্দ	: বিশেষণ রূপে	-	মন্দ কথা বলতে নেই।
	বিশেষ্য রূপে	-	এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?
পুণ্য	: বিশেষণ রূপে	-	তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।
	বিশেষ্য রূপে	-	পুণ্যে মতি হোক।
নিশীথ	: বিশেষণ রূপে	-	নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি।
	বিশেষ্য রূপে	-	গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত।
শীত	: বিশেষণ রূপে	-	শীতকালে কুয়াশা পড়ে।
	বিশেষ্য রূপে	-	শীতের সকালে চারদিক কুয়াশায় অন্ধকার।
সত্য	: বিশেষণ রূপে	-	সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল।
	বিশেষ্য রূপে	-	এ এক বিরাট সত্য।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্যের পরিবর্তন যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।
সর্বনাম সাধারণত ইতোপূর্বে ব্যবহৃত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ। যেমন- হস্তী প্রাণিজগতের সর্ববৃহৎ প্রাণী। তার শরীরটি যেন বিরাট এক মাংসের স্তূপ। দ্বিতীয় বাক্যে 'তার' শব্দটি প্রথম বাক্যের 'হস্তী' বিশেষ্য পদটির প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই , 'তার' শব্দটি সর্বনাম পদ। বিশেষ্য পদ অনুক্ত থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন:

ক. যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।
খ. ধান ভানতে যারা শিবের গীত গায়, তারা স্থির লক্ষ্যে পৌছতে পারে না।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে, নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

(১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এঁ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।
(২) আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
(৩) সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
(৪) দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব।
(৫) সাকুল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।

(৬) প্রশ্নবাচক : কে, কি , কী, কোন, কাহার, কার, কিসে ?
(৭) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
(৮) ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
(৯) সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
(১০) অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সর্বনামের পুরুষ

'পুরুষ' একটি পারিভাষিক শব্দ । বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই।
ব্যাকরণে পুরুষ তিন প্রকার। যথা:

১. উত্তম পুরুষ ২. মধ্যম পুরুষ ৩. নাম পুরুষ

১. **উত্তম পুরুষ** : স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ। আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ উত্তম পুরুষ।
২. **মধ্যম পুরুষ** : প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনারা, আপনার, আপনাদের প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ মধ্যম পুরুষ।
৩. **নাম পুরুষ** : অনুপস্থিত অথবা পরোভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। সে, তারা, তাহারা, তাদের , তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের প্রভৃতি নাম পুরুষ। (সমস্ত বিশেষ্য শব্দই নাম পুরুষ)।

পুরুষভেদে ব্যক্তিবাচক সর্বনামগুলোর রূপ

রূপ	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	নাম পুরুষ
সাধারণ	আমি. আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের, কবিতায়: মোর, মোরা	তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমার, তোমাদের	সে, তারা, তাহারা, তাকে, তাহাকে
সম্ভ্রমাত্মক		আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনার, আপনাদের	তিনি, তাঁরা, তাঁহারা, তাঁদের, তাঁহাদের, তাঁহাদিগকে, তাঁদেরকে, তাঁহাকে, তাঁকে, ইনি, এঁর, এঁরা, ইঁহাদের, এঁদের, ইঁহাকে, এঁকে, উনি, ওঁরা, ওর, ওঁদের
তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক			ইহা, ইহারা, এই, এ, এরা, উহা, উহারা, ও, ওরা, ওদের

সর্বনামের বিভক্তিগ্রাহী রূপ : বাংলা সর্বনামসমূহ কর্তৃকারক ভিন্ন অন্যান্য কারকে বিভক্তিযুক্ত হওয়ার পূর্বে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। সর্বনামের এ রূপটিকে বিভক্তিগ্রাহী রূপ বলা হয়।
কর্তৃকারকে সর্বনামের মূল রূপটিই ব্যবহৃত হয় এবং একে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত এক বচন ধরা হয়।

	কর্তৃকারকে প্রথমা এক বচন		অন্যান্য কারকে বিভক্তিগ্রাহী রূপ	
সাধারণ	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক
আমি				
তুমি	আপনি	তুই	আপনা	তোমা, তো
সে	তিনি		তাঁহা, তাঁ	তাহা, তা
যে	যিনি		যাঁহা, যাঁ	যাহা, যা
	ইনি	এ	ইঁহা, এঁ	ইহা, এ
	উনি	উহা	উঁহা, ওঁ	উহা,ও
কে, কি, কী		কে, কি, কী		কাহা, কা

জেনে রাখো:

১. চলিত ভাষায়-
(ক) তুচ্ছার্থে তাহা স্থানে তা, যাহা স্থানে যা, কাহা স্থানে কা, ইহা স্থানে এ, উহা স্থানে ও আদেশ হয়।
(খ) সম্ভ্রমার্থে এগুলোর সাথে একটি চন্দ্রবিন্দু সংযোজিত হয়। যথা- তাহা+দের= তাহাদের (সাধু) তাদের (চলিত)। (সম্ভ্রমার্থে) তাঁহা+দের=তাঁহাদের (সাধু) তাঁহাদের (চলিত)।
২. করণ কারকে অনুসর্গ ব্যবহারের পূর্বে মূল সর্বনাম শব্দের সঙ্গে ও, এর বা এক বিভক্তি যোগ করে নিতে হয়। যেমন- তাহাকে দিয়া, তাকে দিয়ে, তাহার দ্বারা, তার দ্বারা, আমাকে দিয়ে।
৩. ষষ্ঠী বিভক্তি অর্থে ঈয়-প্রত্যয়যুক্ত সর্বনামজাত বিশেষণ শুধু তৎসম সর্বনামের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যথা- মৎ+ঈয়= মদীয়, ভবৎ+ঈয়= ভবদীয়, তৎ+ঈয়=তদীয়।
৪. 'কী' সর্বনামটি কোনো কোনো কারকে 'কিসে' বা (ষষ্ঠী ভিভিক্তিযুক্ত হয়ে) 'কীসের' রূপ গ্রহণ করে। যথা: কী+দ্বারা, কী+থেকে 'কীসে থেকে, কীসের থেকে।

সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. বিনয় প্রকাশে উত্তম পুরুষের এক বচনে দীন, অধম, বান্দা, সেবক, দাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা- 'আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে'। 'দীনের আরজ'।
২. ছন্দবদ্ধ কবিতায় সাধারণত 'আমার' স্থানে মম, 'আমাদের' স্থানে মোদের এবং 'আমরা' স্থানে মোরা ব্যবহৃত হয়। যেমন- 'কে বুঝিবে ব্যথা মম'। ' মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি! বাংলা ভাষা'। 'ক্ষুদ্র শিশু মোরা, করি তোমারি বন্দনা'।
৩. উপাস্যের প্রতি সাধারণত 'আপনি' স্থানে তুমি প্রযুক্ত হয়। যেমন- (উপাস্যের প্রতি ভক্ত) 'প্রভু, তুমি রক্ষা কর এ দীন সেবকে।'

৪. অভিনন্দনপত্র রচনায়ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে 'তুমি' সম্বোধন করা হয়।
৫. তুমি : ঘনিষ্ঠজন, আপনজন বা সমবয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।
তুই : তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা তাই ব্যবহার করি।

অব্যয় পদ

ন ব্যয়= অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই **অব্যয়**। অব্যয় শব্দের সাথে কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, সেগুলোর এক বচন বা বহু বচন হয় না এবং সেগুলোর স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।
যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধণ করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।
বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে- বাংলা অব্যয় শব্দ, তৎসম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশি অব্যয় শব্দ।

১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও , হাঁ, না ইত্যাদি।
২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত, ইত্যাদি। 'এবং ও 'সুতরাং' তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে 'এবং' শব্দের অর্থ এমন, আর 'সুতরাং' অর্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু এবং= ও (বাংলা), সুতরাং=এতএব (বাংলা)।
৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

বিবিধ উপায়ে গঠিত অব্যয় শব্দ

১. একাধিক অব্যয় শব্দযোগে : কদাপি, নতুবা, এতএব, অথবা ইত্যাদি।
২. আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক একই শব্দের দুইবার প্রয়োগে : ছি ছি, ধিক্ ধিক্, বেশ বেশ ইত্যাদি।
৩. দুটি ভিন্ন শব্দযোগে : মোটকথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।
৪. অনুকার শব্দযোগে : কুহু কুহু, গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, ছল ছল, কন কন ইত্যাদি।

অব্যয়ের প্রকাভেদ :

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার :

১. সমুচ্চয়ী অব্যয়
২. অনন্বয়ী অব্যয়
৩. অনুসর্গ অব্যয়
৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

১. সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

ক. সংযোজক অব্যয়

i. উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে 'ও' অব্যয়টি বাক্যস্থিত দুটি পদের সংযোজক করছে।
ii. তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এখানে 'তাই' অব্যয়টি দুটি বাক্যের সংযোজন ঘটাচ্ছে।
আর, অধিকন্তু , সুতরাং শব্দগুলোও সংযোজক অব্যয়।

খ. বিয়োজক অব্যয়

i. হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী।
এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি পদের (হাসেম এবং কাসেমের) বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাচ্ছে।
ii 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'। এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি বাক্যাংশের বিয়োজক।

আমরা চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। এখানে 'কিন্তু' অব্যয় দুটি বাক্যের বিয়োজক ।বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

গ. সংকোচক অব্যয় : তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে 'অথচ' অব্যয়টি দুটি বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে। তাই তাদের অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন-

১. তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে।
২. আজ যদি (শর্ত বাচক) পারি, একবার সেখানে যাব।
৩. এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পারে।

২. অনন্বয়ী অব্যয় : যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন-

ক. উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি ! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ।
খ. স্বীকৃতিবা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে : হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।
গ. সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আলবত যাব। নিশ্চয়ই পারব।

ঘ. অনুমোদনবাচকতায় : আপনি যখন বলেছেন, বেশ তো আমি যাব।
ঙ. সমর্থনসূচক জবাবে : আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।
চ. যন্ত্রণা প্রকাশে : উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।
ছ. ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে : ছি ছি, তুমি এত নীচ!
কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
জ. সম্বোধনে : 'ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।'
ঝ. সম্ভাবনায় : 'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।'

ঞ. **বাক্যালংকার অব্যয়** : কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থকবাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন-
১. কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে।
২. ' হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।'

৩. অনুসর্গ অব্যয় : যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যথা- ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)।
অনুসর্গ অব্যয় 'পদান্বয়ী' নামেও পরিচিত।
অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার :
ক. বিভক্তিসূচক অব্যয়। খ. বিভক্তি রুপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

৪. অনুকার অব্যয় : যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যথা:

বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়	মেঘের গর্জন- গুড় গুড়
বৃষ্টির তুমুল শব্দ- ঝম ঝম	সিংহের গর্জন -গর গর
স্রোতের ধ্বনি- কল কল	ঘোড়ার ডাক- চিঁহি চিঁহি
বাতাসের গতি- শন শন	কাকের ডাক- কা কা
শুষ্ক পাতার শব্দ- মর মর	কোকিলের রব- কুহু কুহু
নুপুরের আওয়াজ- রুম ঝুম	চুড়ির শব্দ- টুং টাং

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত। যথা-
ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতাবাচক) , খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ঝল মল, চক চক, ছম ছম, টন টন, খট খট ইত্যাদি।
পরিশিষ্ট
ক. অব্যয় বিশেষণ : কতগুলো অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হলে নাম- বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণের অর্থবাচকতা প্রকাশ করে থাকে। এদের অব্যয় বিশেষণ বলা হয়। যথা- নাম- বিশেষণ : অতি ভক্তি চোলের লক্ষণ । ভাব-বিশেষণ : আবার যেতে হবে। ক্রিয়া-বিশেষণ : অন্যত্র চলে যায়।
খ. নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় : কতগুলো যুগ্মশব্দ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল , সেগুলো নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় রূপে পরিচিত। যেমন : যথা-তথা, যত-তত, যখন-তখন, যেমন-তেমন, যেরূপ- সেরূপ ইত্যাদি।
উদাহরণ - যথা ধর্ম তথা জয়। যত গর্জে তত বর্ষে না।
গ. ত (সংস্কৃত তস্) প্রত্যয়ান্ত অব্যয় : এরকম তৎসম অব্যয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যথা- ধর্মত বলছি। দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষায় ফেল করেছি। অন্তত তোমার যাওয়া উচিত। জ্ঞানত মিথ্যা বলিনি।

একই অব্যয় শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

১. আর- পুনরাবৃত্তি অর্থে : ও দিকে আর যাব না।
নির্দেশ অর্থে : বল, আর কী চাও ?
নিরাশায় : সে দিন কি আর আসবে ?
বাক্যালংকারে : আর কি বাজবে বাঁশি?
২. ও- সংযোগ অর্থে : করিম ও রহিম দুই ভাই।
সম্ভাবনায় : আজ বৃষ্টি হতেও পারে।
তুলনায় : ওকে বলাও যা, না বলাও তা।
স্বীকৃতি জ্ঞাপনে : খেতে যাবে ? গেলেও হয়।
হতাশা জ্ঞাপনে : এত চেষ্টাতেও হলো না।
৩. কি/কী- জিজ্ঞাসায় : 'তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ ?
বিরক্তি প্রকাশে : কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
সাকুল্য অর্থে : কি আমীর কি ফকির, একদিন সকলকেই যেতে হবে।
বিড়ম্বনা প্রকাশে : তোমাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়লাম।
৪. না- নিষেধ অর্থে : এখন যেও না।

বিকল্প প্রকাশে	: তিনি যাবেন, না হয় আমি যাব।
আদও প্রকাশে বা অনুরোধে	: আর একটি মিষ্টি না খোকো। আর একটা গান গাও না।
সম্ভাবনায়	: তিনি না কি ঢাকায় যাবেন।
বিস্ময়ে	: কী করেই না দিন কাটাচ্ছে।
তুলনায়	: ছেলে তো না, যেন একটা হিটলার।
৫. যেন- উপমার	মুখ যেন পদ্মফুল।
প্রার্থনায়	: খোদা যেন তোমার মঙ্গল করেন।
তুলনায়	: ইস্, ঠান্ডা যেন বরফ।
অনুমানে	: লোকটা যেন আমার পরিচিত মনে হলো।
সতর্ককরণে	: সাবধানে চল, যেন পা পিছলে না পড়।
ব্যঙ্গ প্রকাশে	: ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল।

ক্রিয়াপদ

১. তাহিয়া বই পড়ছে।

২. তোমরা আগামী বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে।

'পড়ছে' এবং ' দেবে' পদ দুটো দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝাচ্ছে বলে এরা ক্রিয়াপদ।

যে পদের দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দ্বারা কোনো পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কালে কোনো কার্যের সংঘটন বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। ওপরের উদাহরণে নাম পুরুষ 'তাহিয়া' কর্তৃক বর্তমান কালে 'পড়া' কার্যের সংঘটন প্রকাশ করছে। দ্বিতীয় উদাহরণে মধ্যম পুরুষ, ' তোমরা' ভবিষ্যৎ ক্রিয়া সংঘটনের সম্ভাবনা প্রকাশ করছে।

ক্রিয়াপদের গঠন : ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন করতে হয়। যেমন-
'পড়ছে'- পড় 'ধাতু' +'ছে' বিভক্তি।

অনুক্ত ক্রিয়াপদ : ক্রিয়াপদ বাক্যগঠনের অপরিহার্য অঙ্গ। ক্রিয়াপদ ভিন্ন কোনো মনোভাবই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। তবে কখনো কখনো বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য বা অনুক্ত থাকতে পারে। যেমন:

ইনি আমার মামা= ইনি আমার মামা(হন)।

আজ প্রচণ্ড গরম= আজ প্রচণ্ড গরম (অনুভূত হচ্ছে)।

তোমার মা কেমন ? = তোমার মা কেমন (আছেন)?

বাক্যে সাধারণত 'হু' এবং 'আছে' ধাতু গঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে।

বাংলা ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ক্রিয়াপদকে তিনটি মাপকাঠিতে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো : ১. অর্থ বা ভাব প্রকাশের দিক থেকে ২. গঠনগত দিক থেকে ৩. কর্মের দিক থেকে।

১. অর্থ বা ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। যথা: ক.সমাপিকা ক্রিয়া ও খ. অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক.সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ বা ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন – আমরা সত্য কথা বলি।

খ. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ বা ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে পারে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন – সে কলেজে যেয়ে ক্লাস করবে।

২. গঠন বৈশিষ্ট্য বিচারে ক্রিয়া চার প্রকার। নিছে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. যৌগিক ক্রিয়া : একটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া যোগে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন – সুখবর শুনে মনন আনন্দে নেচে উঠল।

ক. মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধনাত্মক অব্যয় এর সাথে কর, হ , দে, পা, যা, কাট, ছার, ধর, মার প্রভৃতি ধাতু যোগে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন – শিক্ষক আমার ছেলেটাকে মানুষ করলেন।

গ. প্রযোজক ক্রিয়া : ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন: কাজটা ভালো দেখায় না।

ঘ. নামধাতুর ক্রিয়া : নামধাতুর সাথে বিভক্তি যোগে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে নামধাতুর ক্রিয়া বলে। যেমন – ফল ফলানো আনন্দের কাজ।

৩. কর্মের দিক থেকে ক্রিয়া : কর্মপদ অনুসারে ক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : যথা: ক . সকর্মক ক্রিয়া ও খ. অকর্মক ক্রিয়া

সকর্মক ক্রিয়া : যে বাক্যে এক বা একাধিক কর্ম থাকে, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন – মুগ্ধ বই পড়ে।

অকর্মক ক্রিয়া : যে বাক্যে কর্ম থাকে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন – পাখি ডাকে।

ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদ

ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো নিম্নরূপ:

(১) সমাপিকা ক্রিয়া ঔ (২) অসমাপিকা ক্রিয়া।

নিচে এদের পার্থক্য আলোচনা করা হলো :

ক্রম	সমাপিকা ক্রিয়া	অসমাপিকা ক্রিয়া
১	যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি ঘটে, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: তাসনীম স্কুলে যায়।	যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি ঘটে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: তাসনীম স্কুলে যেয়ে.....।
২	সমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। যেমন: আলভি গান গায়।	অমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পায় না। যেমন: আলভি গান গায়ে.....।
৩	অসমাপিকা ক্রিয়ার ন্যায় সমাপিকা ক্রিয়া নির্ভরশীল নয়, স্বাধীন।	অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।
৪	সার্থক বাক্য গঠনে সমাপিকা ক্রিয়া অপরিহার্য।	সার্থক বাক্য গঠনে অসমাপিকা ক্রিয়া অপরিহার্য নয়।
৫	সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণত বাক্যের শেষে বসে। যেমন: তাসনীম বই পড়ে।	অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন: তাসনীম চেয়ারে বসে বই পড়ে।
৬	কর্তার রূপ পরিবর্তিত হলে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়। যেমন: সে চেয়ারে বসে পড়ে।	কর্তার রূপ পরিবর্তিত হলে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয় না। যেমন: তিনি চেয়ারে বসে পড়েন।

উপরে বর্ণিত পার্থক্যগুলোই সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রধান পার্থক্য।

সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ

সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা ও উদাহরণ 'ক্রিয়াপদ' সম্পর্কে আলোচনা (চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে) দেওয়া হয়েছে। এখানে সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ও প্রয়োগ বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলা হবে।

সমাপিকা ক্রিয়া

সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যথা-

সানজি বই পড়ে। ক্রিয়া-সকর্মক, কাল- বর্তমান।

আয়মান সারাদিন খেলেছিল। ক্রিয়া-অকর্মকম কাল-অতীত।

আমি তোমাকে একটি কলম উপহার দেব। ক্রিয়া-দ্বিকর্মক, কাল-ভবিষ্যৎ।

অসমাপিকা ক্রিয়া

অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

ধাতুর সঙ্গে কাল নিরপেক্ষ-ইয়া (য়ে), -ইতে (তে) অথবা- ইলে (লে) বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন- দরিদ্রে পাইলে ধনহয় গর্বস্ফীত। ' যত্ন করলে রত্ন মেলে। তাকে খুঁজে নিয়ে আসতে চেষ্টা করবে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা

অসমাপিকা ক্রিয়া ঘটিত বাক্যে একাধিক প্রকার কর্তা (কর্তৃকারক) দেখা যায়-

১. **এক কর্তা :** বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক বা অভিন্ন হতে পারে। যথা- তুমি চাকরি পেলে আর কি দেশে আসবে ? 'পেলে' (অসমাপিকা ক্রিয়া) এবং 'আসবে' (সমাপিকা ক্রিয়া) উভয় ক্রিয়ার কর্তা এখানে 'তুমি'।

২. **অসমান কর্তা :** বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক না হলে সেখানে কর্তাগুলোকে অসমান কর্তা বলা হয়। যেমন-

ক. **শর্তাধীন কর্তা :** এ জাতীয় কর্তাদের ব্যবহার শর্তাধীন হতে পারে। উদাহরণ - তোমরা বাড়ি এলে আমি রওনা হব। এখানে 'এলে' অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ' তোমরা' এবং 'রওনা হব' সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা আমি'। তোমাদের বাড়ি আসার ওপর আমার রওনা হওয়া নির্ভরশীল বলে এ জাতীয় বাক্যে কর্তৃপক্ষের ব্যবহার শর্তাধীন।

খ. **নিরপেক্ষ কর্তা :** শর্তাধীন না হয়েও সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপদ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম কর্তৃপদটিকে বলা হয় নিরপেক্ষ কর্তা। যেমন- সূর্য অস্তমিত হলে যাত্রীদল পথ চলা শুরু করল। এখানে 'যাত্রীদের' পথ চলার সঙ্গে 'সূর্য' অস্তমিত হওয়ার কোনো শর্ত বা সম্পর্ক নেই বলে 'সূর্য' নিরপেক্ষ কর্তা।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

১. 'ইলে' 'লে' বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. কার্যপরম্পরা বোঝাতে : চারটা বাজলে স্কুলের ছুটি হবে।

খ. প্রশ্ন বা বিস্ময় জ্ঞাপনে : একবার মরলে কি কেউ ফেরে?

গ. সম্ভাব্যতা অর্থে : এখন বৃষ্টি হলে ফসলের ক্ষতি হবে।

ঘ. সাপেক্ষতা বোঝাতে : তিনি গেলে কাজ হবে।
ঙ. দার্শনিক সত্য প্রকাশে : জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কেব?
চ. বিধিনির্দেশে : এখানে প্রচারপত্র লাগালে ফৌজদারিতে সোপর্দ হবে।
ছ. সম্ভাবনার বিকল্পে : আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা।
জ. পরিণতি বোঝাতে : বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দি হবে।

২. 'ইয়া' 'এ' বিভক্তি যুক্তি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার
ক. অনন্তরতা বা পর্যায় বোঝাতে : হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বস।
খ. হেতু অর্থে : ছেলেটি কুসঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে গেল।
গ. ক্রিয়া বিশেষণ অর্থে : চেঁচিয়ে কথা বলো না।
ঘ. ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে : 'হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া গাহিয়া গান।'
ঙ. ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে : সেখানে আর গিয়ে কাজ নেই।
চ. অব্যয় পদের অনুরূপ : ঢাকা গিয়ে বাড়ি যাব।

৩. 'ইতে' 'তে' বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার
ক. ইচ্ছা প্রকাশে : এখন আমি যেতে চাই।
খ. উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত অর্থে : মেলা দেখতে ঢাকা যাব।
গ. সামর্থ্য বোঝাতে : আয়মান এখন হাঁটতে পারে।
ঘ. বিধি বোঝাতে : বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করতে হয়।
ঙ. দেখা বা জানা অর্থে : তাহিয়া গাইতে জানে।
চ. আবশ্যকতা বোঝাতে : এখন ট্রেন ধরতে হবে।
ছ. সূচনা বোঝাতে : জারিফ এখন ইংরেজি পড়তে শিখেছে।
জ. বিশেষণবাচকতায় : লোকটাকে দৌড়াতে দেখলাম।
ঝ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : তোমাকে তো এ গ্রামে থাকতে দেখিনি।
ঞ. অনুসর্গরূপে : কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল।
ট. বিশেষ্যের সঙ্গে অন্বয় সাধনে : 'দেখিতে বাসনা মাগো তোমার চরণ।'
ঠ. বিশেষণের সঙ্গে অন্বয় সাধনে : পদ্মফুল দেখতে সুন্দর।

৪. 'ইতে' 'তে' বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগ
ক. নিরন্তরতা প্রকাশে : কাটিতে কাটিতে ধান এলা বরষা।
খ. সমকাল বোঝাতে : সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা 'দেখিতে দেখতি'।

স্মরণযোগ্য : রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে বাক্য গঠিত হতে পারে। যেমন- গরু মেরে জুতা দান। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।

গঠন অনুযায়ী ক্রিয়া

গঠন অনুযায়ী বাংলা ক্রিয়াপদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো নিম্নরূপ:

(১) যৌগিক ক্রিয়া (২) মিশ্র ক্রিয়া, (৩) প্রযোজক ক্রিয়া ও (৪) নাম ধাতুর ক্রিয়া।

নিচে উদাহরণসহ এদের পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

(১) যৌগিক ক্রিয়া: একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলে যদি একটি বিশেষ ক্রিয়াপদ গঠন করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: তাসনীম আনন্দে নেচে উঠল। অবশেষে আলভী কথাটা বলে ফেলল। এখানে 'নেচে উঠল' এবং 'বলে ফেলল' ক্রিয়া দুটি হলো যৌগিক ক্রিয়া।

(২) মিশ্র ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সাথে কর, হ, দে, পা ইত্যাদি ধাতু সমন্বয়ে যে ক্রিয়াপত গঠিত হয়, তাকে মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন: আমরা যমুনা ব্রীজ দর্শন করলাম। তাসনীমকে দেখে প্রীত হলাম। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।

উল্লিখিত উদাহরণে 'দর্শন করলাম', 'প্রীত হলাম', 'ঝিম ঝিম করছে' ক্রিয়াগুলো হলো মিশ্র ক্রিয়া।

উপযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যৌগিক ক্রিয়া ও মিশ্র ক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা, যৌগিক ক্রিয়ায় দুটি ক্রিয়া পদ থাকে: এর একটি হলো সমাপিকা ক্রিয়া এবং অন্যটি অসমাপিকা ক্রিয়া।

অন্যদিকে মিশ্র ক্রিয়ায় একটি ক্রিয়া পদের সাথে বিশেষ অর্থে বিশেষ্য বা বিশেষণ বা ধ্বনাত্মক অব্যয় যুক্ত থাকে।

(৩) প্রয়োজক ক্রিয়া : ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন: কাজটা ভালো দেখায় না।

(৪) নামধাতুর ক্রিয়া : নামধাতুর সাথে বিভক্তি যোগে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে নামধাতুর ক্রিয়া বলে। যেমন – ফল ফলানো আনন্দের কাজ।

সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া

কর্মের দিক থেকে ক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(১) সকর্মক ক্রিয়া ও (২) অকর্মক ক্রিয়া।

নিচে উদাহরণসহ এদের পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

(১) সকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া কর্মপদ আছে, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: তাসনীম বই পড়ে। সে ছবি আঁকে। এখানে 'পড়ে' ও 'আঁকে' ক্রিয়ার কর্ম হলো 'বই' ও 'ছবি'

সকর্মক ক্রিয়ার আবার কখনও কখনও দু'টি কর্ম থাকে। যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলায় হয়। যেমন: তাসনীম আলভীকে চাঁদ দেখাচ্ছে। এখানে 'দেখাচ্ছে' ক্রিয়াটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া: কেননা, এর দুটি কর্ম রয়েছে। কর্ম দুটি হলো **'চাঁদ' ও 'আলভী'**।

(২) অকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: তাসনীম প্রতিদিন লাইব্রেরীতে যায়। এখানে 'যায়' ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া। কারণ, এর কোন কর্ম নেই।

কর্ম চিহ্নিত করার উপায়:

ক্রিয়াকে কী অথবা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই কর্ম। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সমর্মক ক্রিয়া। যেমন- বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : কী দিয়েছেন ? উত্তর : কলম (কর্মপদ)।

প্রশ্ন : কাকে দিয়েছেন ? উত্তর : আমাকে (কর্মপদ)।

' দিয়েছেন' ক্রিয়াপদটির কর্ম পদ থাকায় এটি সকর্মক ক্রিয়া।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্ম পদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে গৌণ কর্ম বলে। বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন বাক্যে 'কলম' (বস্তু) মুখ্যকর্ম এবং 'আমাকে' (ব্যক্তি) গৌণ কর্ম।

সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদতে সমধাতুজ কর্ম বা ধাতুর্থক কর্মপদ।

যেমন- আর কত খেলা খেলবে। মূল ' খেল' ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ ' খেলবে' এবং কর্মপদ ' খেলা' উভয়ই গঠিত হয়েছে। তাই ' খেলা' পদটি সমধাতুজ বা ধাতুর্থক কর্ম।

সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সমর্কম করে। যেমন-

এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে ?

বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

আর মায়াকান্না কেঁদো না গো বাপু।

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ :

প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক হতে পারে। যেমন:

অকর্মক	সকর্মক
আমি চোখে দেখি না।	আকাশে চাঁদ দেখি না।
ছেলেটা কানে শোনে না।	ছেলেটা কথা শোনে।
আমি রাতে খাব না।	আমি রাতে ভাত খাব না।
অন্ধকারে আমার খুব ভয় করে।	বাবাকে আমার খুব ভয় করে।

যে ক্রিয়া একজনের প্রয়োজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। (সংস্কৃত ব্যাকরণে একে ণিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়)।

প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন:

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক ক্রিয়া
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখাচ্ছেন
(তুমি)	খোকাকে	কাঁদিও না।
সাপুড়ে	সাপ	খেলায়।

জ্ঞাতব্য : প্রযোজক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হলে অকর্মক প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়।

প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন : প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু = মূল ক্রিয়ার ধাতু+আ। যেমন মূল ধাতু হাস্ +আ= হাসা (প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু)। হাসা+চ্ছেন বিভক্তি= হাসাচ্ছেন (প্রযোজক ক্রিয়া)।

৪. নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বনাত্বক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয়যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়। নামধাতুর সঙ্গে পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া-বিভক্তি যোগে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন-

ক. বেত (বিশেষ্য)+আ (প্রত্যয়)= বেতা (নামধাতু)। যথা- শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

খ. বাঁকা (বিশেষণ) +আ(প্রত্যয়)= বাঁকা (নামধাতু)। যথা- কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

গ. ধ্বনাত্মক অব্যয় : কন কন- দাঁতটি ব্যথায় কনকনাচ্ছে । ফোঁস- অজগরটি ফোঁসাচ্ছে।

আ-প্রত্যয় যুক্ত না হয়েও কয়েকটি নামধাতু বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন-

ফল- বাগানে বেশ কিছু লিচু ফলেছে।

টক- তরকারি বাসি হলে টকে।

ছাপা- আমার বন্ধু বইটা ছেপেছে।

ক্রিয়ার ভাব (Mood)

১. সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

২. এখন বাড়ি যাও।

৩. সে পড়লে পাশ করত।

৪. তোমার কল্যাণ হোক।

ওপরের বাক্যগুলোতে ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

ক্রিয়ার যে অবস্থার দ্বারা তা ঘটার ধরন বা রীতি প্রকাশ পায়, তাকে ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার বলে।

ক্রিয়ার ভাব বা ধরন চার প্রকার :

১. নিদের্শক ভাব (Indicative Mood)

২. অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood)

৩. সাপেক্ষ ভাব (Subjunctive Mood)

৪. আকাঙক্ষা প্রকাশক ভাব (Optative Mood)

নির্দেশক ভাব: সাধারণ ঘটনা নির্দেশ করলে বা কিছু জিজ্ঞাসা করলে ক্রিয়াপদের নির্দেশক ভাব হয় ।যথা-

ক. সাধারণ নির্দেশক : আমরা বই পড়ি। তারা বাড়ি যাবে।
খ. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা : আপনি কি আসবেন ? সে কি গিয়েছিল ?

২. অনুজ্ঞা ভাব : আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ ইত্যাদি সূচিত হলে ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা ভাব হয় । যেমন-

ক. আদেশাত্মক : বর্তমান কালে - চুপ কর।
: ভবিষ্যৎ কালে - তুমি কাল যেও।
খ. নিষেধাত্মক : বর্তমান কালে - অন্যায় কাজ করো না।
: ভবিষ্যৎ কালে - মিথ্যা বলবে না।
গ. অনুরোধসূচক : বর্তমান কালে - ছাতাটা দিন তো ভাই।
: ভবিষ্যৎ কালে - আপনারা আসবেন।
ঘ. উপদেশাত্মক : বর্তমানে কালে - মন দিয়ে পড়।
: ভবিষ্যৎ কালে - স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো।

৩. সাপেক্ষ ভাব : একটি ক্রিয়ার সংঘটন অন্য একটি ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে, নির্ভরশীল ক্রিয়াকে সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন-

ক. সম্ভাবনায় : তিনি ফিরে এলে সবকিছুর মীমাংসা হবে। যদি সে পড়ত তবে পাশ করত।
খ. উদ্দেশ্য বোঝাতে : ভালো করে পড়লে সফল হবে।
গ. ইচ্ছা বা কামনায় : আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত কষ্ট হত না।

৪. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব : যে ক্রিয়াপদে বক্তা সোজাসুজি কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তাকে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন- সে যাক। যা হয় হোক। সে একটু হাসুক। বৃষ্টি আসে আসুক। তার মঙ্গল হোক।

ক্রিয়া বিশেষণ

যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা-

ক. ক্রিয়া সংগঠনের ভাব : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।
খ. ক্রিয়া সংগঠনের কাল : পরে একবার এসো।

আবেগ শব্দ

যে সমস্ত শব্দ দ্বারা মানুষের মনের ভাব বা আবেগ প্রকাশ পায় সে সমস্ত শব্দকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন: বাহ্! কী চমৎকার ফুল। এখানে 'বাহ্' শব্দটির কোনো অর্থ নেই, কিন্তু এটি মনের গভীর আবেগকে প্রকাশ করেছে। প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলোকে অনন্বয়ী, মনোভাবাত্মক বা অন্তর্ভাবাত্মক অব্যয় বলা হয়ে থাকে।

মনের আবেগ প্রকাশের ধরণ অনুযায়ী আবেগ শব্দকে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন:

(ক) সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ: এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা সিদ্ধান্ত, অনুমোদন, সম্মতি ইত্যাদি নির্দেশ করা হয়। যেমন: না, তোমার সাথে আর পারা গেলো না।
(খ) প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ: এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা কোনো কিছুর প্রশংসা প্রকাশ পায়। যেমন: বাঃ! কী চমৎকার কথা আপনি বললেন।
(গ) বিরক্তিবাচক আবেগ শব্দ: এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা বিরক্তি, ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। যেমন: ছিঃ ছিঃ ! এতো নীচ আচরণ আপনি করতে পারেন!
(ঘ) ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ: এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা ভয় বা যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। যেমন: আঃ! কী বিপদেই না পরলাম।
(ঙ) বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ: এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা বিস্ময় বা আশ্চর্যের ভাব প্রকাশ পায়। যেমন: আরে, এমন সুন্দর ফুল তো আগে দেখি নি!
(চ) করুণাবাচক আবেগ শব্দ: এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা করুণ বা সহানুভূতি প্রকাশ পায়। হায়! হায়! এখন আমাদের কী উপায় হবে।
(ছ) সম্বোধনবাচক আবেগ শব্দ: এ জাতীয় আবেগ শব্দ দ্বারা বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা বা মাধুর্য প্রকাশ করা হয়। যেমন: যা শয়তান! খালি আমার সাথে সবসময় দুষ্টুমি, না!

যোজক

যে শব্দ শ্রেণি দুটি বাক্য কিংবা দুটি পদের মধ্যে সংযোজন কিংবা বিয়োজন অথবা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে। যেমন : মন ও দেহ সুস্থ থাকলেই সুখ। বাঙালি পরিশ্রমী জাতি এবং এরা শান্তিপ্রিয়ও বটে।

যোজক পাঁচ প্রকার যথা : ক. সাধারণ যোজক, খ. বৈকল্পিক যোজক, গ. বিরোধমূলক যোজক, ঘ. কারণবাচক যোজক এবং ঙ. সাপেক্ষ যোজক। নিচে এদের পরিচয় দেয়া হলো :

ক. সাধারণ যোজক : এ শ্রেণির যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যকে সংযুক্ত করে। যেমন : তাসনিম ও জারিফ ভাই-বোন।
খ. বৈকল্পিক যোজক: এ শ্রেণির যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন : আমি হয় ভাত খাব না-হয় রুটি খাব।
গ. বিরোধ মূলক যোজক : এ শ্রেণির যোজক দুটি বাক্যের ভেতরে সংযোগ ঘটিয়ে দ্বিতীয়টির সাহায্যে প্রথমে বাক্যের বক্তব্যের সংশোধন বা বিরোধ নির্দেশ করে।
যেমন : করিম **অথবা** রহিম যে কোনো একজন আসলেই হবে।
ঘ. কারণবাচক যোজক : এ জাতীয় যোজক এমন দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ । যেমন : পাপ করেছ, **তাই** প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।
ঙ. সাপেক্ষ যোজক : এ শ্রেণির যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন : **যেমন** বুনো ওল **তেমনি** বাঘা তেঁতুল।

অনুসর্গ

অনুসর্গের সংজ্ঞা ঃ বাংলা ভাষায় যে অব্যয় পদগুলো কখনও স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনও শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বলে । যেমন- মাঝ, দি-ক, দি-য়, প-র ইত্যাদি ।

অনুসর্গ প্র-য়াগ ক-র পাঁচটি বা-ক্যর উদাহরণ ঃ

১। **মা-ঝ** ঃ অপু আবার ফি-র এ-স-ছ আমা-দর মা-ঝ ।
২। **দি-ক** ঃ অবাক হ-য় ওর দি-ক তাকি-য় থা-ক ওরা ।

৩। **দিয়ে:** হাসি দিয়ে ঘরটাকে ভরিয়ে রাখতো তপু
৪। **প-র** ঃ বছর খা-নক প-র বেনু-ক বি-য় ক-র তপু।
৫। **সঙ্গে** ঃ ক্যাপিটালে তপুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।
৬। **হ-ত** ঃ ভোর হ-ত ছে-লবু-ড়া এ-স জমা-য়ত হ-লা।

-০-